প্রসঙ্গ সি পি আই এমঃ কিছু ভাবনা

লিখছেন --- পিনাকী মিত্র

মুখবন্ধ

অত:পর লোকসভা নির্বাচনেও পর্যুদস্ত সি পি এম। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ধাক্কা এবং তজ্জনিত 'আত্মসমীক্ষা'র পর্ব শেষ করে, শরিকি অনৈক্যের ফুটিফাটাগুলোয় প্রেমের প্রলেপ লাগিয়ে, ন্যানো বিদায় এবং বিমানবাবুর মানুষের কাছে বারংবার ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশকে পাথেয় করে সি পি এমের মধ্যে যখন ফিরে আসছিল পঞ্চায়েতপূর্ব সেই আত্মবিশ্বাস, তাপসী মালিকের সিডি থেকে শুরু করে সুবোধ সরকারের টিভি শো, বুদ্ধবাবুর প্রকাশ্য ভাষণ থেকে শুরু করে অশোকবাবুর নেপথ্য ভাষণ - সবেতেই যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল '৭০ এর অমিতাভসুলভ সেই যোশ, ঠিক তখনই 'কোথা হইতে কি হইয়া গেল, সি পি এম লোকসভা নির্বাচনে ধরাশায়ী হইয়া গেল'।

সি পি আই এম একটি সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক পার্টি। তারা যা করে নিষ্ঠাভরে এবং দলবদ্ধভাবে করে থাকে। সেটি শিল্পায়ন হোক বা আত্মসমালোচনা। তাই বিমান বসু থেকে জয়দেব বসু, পলিটব্যুরো থেকে ওর্কুট সমর্থক - সকলেই এখন নিজের নিজের মত করে ঐ দ্বিতীয় কাজটি করে চলেছেন। অর্থাৎ আত্মসমীক্ষা। আমরা এই লেখায় বিভিন্ন স্তরের আত্মসমীক্ষায় মূলতঃ যে কথাগুলো উঠে আসছে সেগুলো নিয়ে অল্পবিস্তর পিএনপিসি করব। বোঝার চেষ্টা করব সেসবের পেছনের রাজনীতিকে। আর তার সাথে সাথেই একটু অমৃতলালগিরিও করতে ছাড়ব না। অর্থাৎ ভবিষ্যত নিয়ে দু-চারটে অকালপক্ক কমেন্টও এই লেখার শেষে থাকবে। সঙ্গে থাকুন।

নির্বাচনী বিপর্যয় ও কংগ্রেস হাওয়া

এবারের নির্বাচনে সিপিএম এর বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে, ফর্মাল এবং ইনফর্মাল, দুই স্তরেই একটা বিষয়কে খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেটা হল - এবারের নির্বাচনে দেশজুড়ে যে 'কংগ্রেস হাওয়া' ছিল সেটিকে বুঝতে না পারা। বলা হচ্ছে, বিপর্যয়ের পিছনে, এই বুঝতে না পারার একটা ভূমিকা আছে। এটা বুঝতে না পারার ফলেই তৃতীয় ফ্রন্ট নিয়ে এত কোমর বেঁধে নেমেছিলেন প্রকাশ কারাত। মায়াবতী, চন্দ্রবাবু থেকে শুরু করে নবীন পট্টনায়েকের মত লোকজনকে নিয়ে তড়িঘড়ি একটা ফ্রন্ট বানানোর পিছনে সোজা হিসেব একটাই ছিল, যে, এই নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হবে। এই ফ্রন্টের পিছনে সি পি আই এমের নেতৃবৃন্দ যতই 'প্রগতিশীল' তকমা সাঁটার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁরা নিজেরাও ভালো করেই জানতেন যে নীতির থেকেও তাঁদের কাছে অনেক বেশী গুরুত্বের ছিল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিক রাখা। তৃতীয় ফ্রন্ট সঙ্গীদের মধ্যে মায়াবতী, জয়ললিতা তাঁদের দুর্নীতির জন্যে কুখ্যাত। চন্দ্রবাবু কুখ্যাত উদার অর্থনীতির প্রথম সফল এবং অতি উদ্যোগী রূপকার হিসেবে। নবীনের হাতে লেগে রয়েছে পস্কো এবং কলিঙ্গনগরের কৃষক ও আদিবাসীর রক্ত। কিন্তু কে না জানে সি পি আই এমের হাতের ছোঁয়ায় পাথরেও প্রাণ আসে, রতন টাটাও হন সমাজসেবী, তাহলে জয়া, মায়া, চন্দ্রবাবু বা নবীনদের প্রগতিশীল হওয়া কি এমন কঠিন কাজ। ফলে চলল অ-কংগ্রেসী, অ-বিজেপি সরকার গড়ে তোলার মহা(ন)সংগ্রাম। গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেলের মত এই আলোচনাও উঠে এল যে বুদ্ধবাবু প্রধানমন্ত্রী হবেন কি না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল 'পিছিয়ে পড়া' পাবলিক এই 'প্রগতিশীল' জোটকে নিতে পারল না।

তো, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই 'কংগ্রেসি হাওয়া'কেই প্রধান কারণ হিসেবে ধরে নেওয়াটা

বালির মধ্যে মুখ গুঁজে উটপাখিবৃত্তি কিনা, সেই কঠিন প্রশ্ন আপাততঃ এখানে করা হচ্ছেনা। এই মুহূর্তে আমাদের প্রশ্নটা একটু অন্যরকম। প্রশ্নটা হল, যদি ধরা যাক সি পি এম নেতৃত্ব বুঝতে পারতেন যে হাওয়া কংগ্রেসের দিকেই, তাহলে তাঁরা কি করতেন ? পরমাণু চুক্তির সময় থেকে কংগ্রেসের সাথে যে তিক্ততা তৈর ী হয়েছিল, সমর্থন তুলে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে যা পূর্ণতা পায়, তাকে একদম 'না' করে দেওয়া কি সম্ভব ছিল ? ছিল না। সেটা করতে গেলে একেবারে পাল্টি খেতে হত, যা সারা ভারতে সি পি এমের ভাবমূর্তিকে আরো বেশী কালিমালিপ্ত করত। কাজেই সেটা অসম্ভব ছিল। আবার মূলধারার রাজনীতিতে একলা এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া - সেটাও কি সি পি আই এমের বর্তমান রাজনীতি হজম করার জায়গায় আছে ? উত্তর হল - না। কাজেই মূলধারার অ-বাম দলগুলোর মধ্যে নিজেদের সঙ্গী সি পি আই এমকে খুঁজতেই হত। তৃতীয় ফ্রন্ট তারই স্বাভাবিক পরিণতি। কাজেই দেখা যাচ্ছে সমর্থন তুলে নেওয়ার পর সি পি এম যা যা করেছে, সেগুলো তাদের রাজনীতির গন্ডীর মধ্যে ভুল কিছু নয়। খুবই কনসিসটেন্ট। অতএব সমর্থন তোলার পর কি হল, তা নয়, সি পি এমের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকে দেখলে ঠিক ভুলের আলোচনাকে ফোকাস করতে হবে তার আগের ঘটনাবলীতে। পরমাণু চুক্তির প্রশ্নে সমর্থন তোলার বিষয়টিকেই, বা তারও আগের ঘটনাবলীকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে, যে আলোচনায় আমরা ঢুকবো পরবর্তী অনুচ্ছেদে।

সমর্থন প্রত্যাহারের আগের কথা

সি পি আই এর প্রো-কংগ্রেস লাইনকে বিরোধ করেই সি পি আই এমের বেড়ে ওঠা। প্রসঙ্গতঃ কংগ্রেস বিরোধিতাকে দেখা হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সমার্থক হিসেবে। সাম্রাজ্যবাদ সি পি আই এমের প্রধান শত্রু, অতএব সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস কংগ্রেসই সি পি আই এমের প্রধান শত্রু - এই সূত্রায়নের উপর ভর করেই আশির দশকের শেষ দিক অব্দি চলেছে সি পি আই এমের রাজনীতি। কিন্তু মাঠময়দানের আন্দোলনের থেকে ইতিমধ্যেই সি পি এমের অনেকখানি দূরত্ব তৈরী হয়েছিল। এবং স্বাভাবিক নিয়মেই কেরালা বা পঃ বঃ এর বাইরে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছিল তারা। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল মূলধারার রাজনীতিতে নিজেদের বন্ধু খুঁজে বের করা এবং প্রধান হয়ে উঠছিল তাদের হাত ধরে মূলধারায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার তাগিদ। মূলতঃ এই তাগিদ থেকেই '৮৯ তে আগুপিছু না ভেবে বি জে পির সাথে জোট করে সি পি এম। এর পরের ইতিহাস সবার জানা। কংগ্রেসের নড়বড়ে অবস্থার সুযোগ নিয়ে বি জে পি বেড়ে ওঠে এবং '৯২ তে ঘটে যায় বাবরি মসজিদের ঘটনা। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা যতই কলঙ্কজনক হোক না কেন, সি পি এমের ক্ষেত্রে তা প্রায় শাপে বর হয়ে যায়। 'ভারতবর্ষের প্রধান বিপদ এখন সাম্প্রদায়িকতা' - এই যুক্তিতে কংগ্রেসকে সমর্থন করার সুযোগ পেয়ে যায় সি পি এম। কোনও উল্লেখযোগ্য আন্দোলন এবং সংগঠনের বিস্তার ছাড়াই ভারতবর্ষের মূলধারার রাজনীতিতে গুরুত্ব বাড়তে থাকে সি পি এমের। যা পরিণতি পায় ২০০৪ সালের অতগুলো আসন লাভ এবং কংগ্রেসের সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থনের মধ্যে দিয়ে।

তো এই অব্দি গল্পটা মসৃণ ছিল। সারা দেশে বইছিল একই সাথে নিওলিবার‍্যালিজম এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির মৃদুমন্দ সুবাতাস। বামেরা একদিকে যেমন ব্যাঙ্ক, বীমা ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ রুখে, একশো দিনের কাজের প্রকল্পের জন্যে তদ্বির করে নিজেদের সমর্থকদের কাছে আস্থা কুড়োচ্ছিলেন, হিরো হচ্ছিলেন, তেমনি পাশাপাশি সেজ আইন নীরবে মেনে নিয়ে, ডি এফ আই ডি-র টাকায় নিজেদের শাসিত রাজ্য পঃ বঃ এর শ্রমিক কর্মচারীদের ভি আর এস দিয়ে, খুচরো ব্যাবসায় বড় পুঁজির ঢোকার ব্যাপারে নীরব থেকে ভারতের বড় মালিক গোষ্ঠীকেও বার্তা পাঠাচ্ছিলেন যে ত্যজ্যপুত্র করার মত 'অবাধ্য ছেলে' তাঁরা নন। এইভাবে দেওয়া ও নেওয়া, শ্যাম ও কুল দুই রেখেই চলা যাচ্ছিল। কিন্তু সমস্যা হল নিওলিবার‍্যালিজম সি পি আই এমের বেঁধে দেওয়া গন্ডীতে সন্তুষ্ট থাকবে কেন ? তার ক্ষিদে তো সর্বগ্রাসী। পিঠের সওয়ারীকেও সে গিলতে চাইবে। অতএব সিঙ্গুর। অতএব নন্দীগ্রাম। নিওলিবার‍্যালিজমের সাথে মুখোমুখি সংঘাতে না গিয়েও

যে 'বাম' ভাবমূর্তিটা ধরে রাখা যাচ্ছিল - সেটা এক বছরের মধ্যে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। দেশে বিদেশে বাম মনস্ক বুদ্ধিজীবিরা প্রশ্ন তুললেন, সব রাজ্যে নিচুতলায় ব্যাপক কনফিউশন, বিতর্ক, সমালোচনা। সেসব আমরা সকলেই জানি।

এই ভজকট এক অবস্থায়, যখন সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে, নিজেদের 'বাম' ভাবমূর্তি প্রায় যায়যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হয়ে উঠল দেশজুড়ে এই 'বাম' ভাবমূর্তিকে পুনরুদ্ধার করা। ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্যেই সামনে চলে আসে পরমাণু চুক্তির বিষয়টা। শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ (অবশ্যই প্রকাশ কারাতের নাম আসবে এ প্রসঙ্গে) এতে শাপে বর দেখলেন। হঠাৎ করেই আমরা দেখতে পেলাম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা আবার সামনের সারিতে চলে এল। তুমুল বিপ্লবীয়ানা প্রদর্শন মারফৎ সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নিল সি পি আই এম। সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাকে চিহ্নিত করা হল একই রকম বিপদ হিসেবে। এই নিয়ে বিতর্ক-টিতর্কও হল, যার জ্বলন্ত প্রমাণ হল, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বহিস্কার।

সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা

এই সাম্প্রদায়িকতা আর সাম্রাজ্যবাদের বিপদের কথাটা নতুন নয়। বহুদিন ধরে সিপিএমের তাত্বিক লেখাপত্রে এরা ঘোরাফেরা করছে। তো সেটা নিয়ে এখানে ছোটো করে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। এরা কি ধরণের ব্যাপার বা বস্তু, একে অপরের সঙ্গে তুলনীয় কিনা, এই নিয়ে ছোট্টো একটা ভাট করা যাক। কেউ প্লিজ বোর হবেন না।

ক্ল্যাসিকাল মার্ক্সবাদে সমাজে দুটো দ্বন্দ্বরত বর্গ বা বিষয়ের কথা বলা হয়। কাঠামো এবং উপরিকাঠামো। বেস এবং সুপারস্ট্রাকচার। প্রথাগত মার্ক্সবাদে অর্থনীতি হল কাঠামো, আর রাজনীতি, দর্শন, সংস্কৃতি - এগুলো উপরিকাঠামো। এছাড়াও প্রথাগত মার্ক্সবাদের ধারাটি যেহেতু এসেন্সিয়ালিস্ট, তাই সেখানে এই বেস এবং সুপারস্ট্রাকচারের মধ্যে বেস হল প্রাইমারি এবং সুপারস্ট্রাকচার হল সেকেন্ডারি। অর্থাৎ রাজনীতি, দর্শন, সংস্কৃতি - এগুলো সবই আসলে অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ। এখন এই ধারণার জায়গা থেকে দেখলে 'সাম্রাজ্যবাদ' একটি অর্থনৈতিক বর্গ। অর্থাৎ কাঠামোগত বিষয়। আবার 'সাম্প্রদায়িকতা' একটি উপরিকাঠামোগত বিষয়। তাই প্রথাগত মার্ক্সবাদে কোনো যুক্তিতেই সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা - এই দুটি বিষয় একই মাপকাঠিতে তুলনীয় হতে পারে না। বামপন্থীরা যেহেতু 'শ্রেণী' নামক অর্থনৈতিক বর্গটিকে নিয়েই মূলতঃ ইন্টারেস্টেড, তাই যেকোনো উপরিকাঠামোগত বিষয়ের পিছনে শ্রেণীসম্পর্ক খোঁজাটাই প্রথাগত মার্ক্সবাদের দস্তুর, সেই উপরিকাঠামোগত বিষয়টিকে একটি স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে গণ্য না করে। এই তত্ত্ব নিয়ে অবশ্য পোস্টমডর্ণিস্টদের ভিন্ন মত আছে। যদিও সেটা আমাদের এই আলোচনার বিষয় নয়। কারণ আমরা যদ্দূর জানি সি পি আই এম এখনও প্রথাগত মার্ক্সবাদে ভরসা রাখেন। তাঁরা পোমো হয়ে গেছেন - এরকম কোনো খবর আমার কাছে অন্ততঃ নেই। তাহলে কি যুক্তিতে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রদায়িকতাকে একই মাপকাঠিতে রেখে তুলনা করেন, কখনও একে কখনও ওকে 'প্রধান শত্রু' বানিয়ে দেন - তা দেবা না জানন্তি। কংগ্রেস থেকে বিজেপি যখন প্রধান বিপদ হয়ে উঠল তখন যেমন সেই আচমকা লাইন বদলের কোনও মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার তাঁরা প্রয়োজন বোধ করেন নি, ঠিক তেমনই এবারে কংগ্রেসের উপর থেকে সমর্থন তোলার সময় কেনই বা হঠাৎ করে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা সম গুরুত্ব পেয়ে গেল - সেটা ব্যাখ্যা করারও কোনও প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নি।

লাইন বদল, কেন ?

তা, এইসব দুমদাম লাইন চেঞ্জ কেন ? এর বাস্তব ভিত্তিটাই বা কি ? এখানে তার একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা যাক।

একটি বামপন্থী দলের চালিকাশক্তি কি হওয়া উচিত ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে কোনও পুরস্কার নেই। সবাই জানেন। আন্দোলন। শ্রেণীসংগ্রাম। ইত্যাদি ইত্যাদি। দরিদ্র, অনগ্রসর, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বামপন্থীরা প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিভাবে ? সিম্পল। তাদের দাবীদাওয়া নিয়ে আপোষহীন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু আর কোনও ভবে কি এই প্রভাব বিস্তার করা বা ধরে রাখা যায় না ? কংগ্রেস, বিজেপির মত জনবিরোধী নীতি রূপায়ণকারী দলগুলো মানুষের মধ্যে প্রভাব বজায় রাখে কি করে ? উত্তরটা হল ক্ষমতায় থাকলে ক্ষমতার প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে। আর ক্ষমতায় না থাকলে ছোটোখাটো আন্দোলনের মাধ্যমে। কিন্তু কখনই সেই আন্দোলন দেশের দেশের শাসক শ্রেণীর গ্রস ইন্টারেস্টকে ব্যহত করে না। তাই যখনই এমন কোনও সমস্যা এসে হাজির হয়, যাতে সেই ইন্টারেস্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখনই এই সমস্ত মূলধারার রজনৈতিক দলগুলোর স্বরূপ মানুষের কাছে উন্মোচিত হয় এবং তাদের গণভিত্তিতে ধ্বস নামে। কিন্তু মানুষের কাছে র‍্যাডিকাল বিকল্প না থাকলে সেই সমর্থন অন্য কোনও মূলধারার দলের দিকেই ধাবিত হয়। বলা যায়, মানুষের সমর্থন এইভাবেই প্রচলিত অপশনগুলোর মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। অন্যদিকে বামপন্থীদের প্রভাবের বিষয়টি গুণগতভাবে আলাদা। যেহেতু তাঁরা এই ব্যবস্থাতেই বিশ্বাসী নন, ফলে প্রচলিত সামাজিক অর্ডারকে চ্যালেঞ্জ করেই তাঁরা এককালে আন্দোলন করেছেন এবং তার মধ্যে দিয়ে যে গণভিত্তি তাঁরা পেয়েছেন একটা সময় পর্যন্ত তার একটা স্থায়িত্ব থাকে। কিন্তু দু দুবার, একবার ১৯৬৭ তে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭০ এ যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেওয়া হল এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরের বার অর্থাৎ ১৯৭৭ এ যখন সি পি আই এমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট দুটি রাজ্যে ক্ষমতায় এল, তখন থেকেই ভারতের শাসকশ্রেণীর আকাঙ্খার সাথে একধরনের অলিখিত বোঝাপড়া তাঁরা করে নেন। বলা যায় তখন থেকেই আপোষহীন আন্দোলনের বদলে ক্ষমতার প্রসাদ বিতরণ গণভিত্তি ধরে রাখার মূল হাতিয়ারে পরিণত হয়। র‍্যাডিকাল ধারাটি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে আন্দোলনের ময়দান থেকে সি পি আই এম ক্রমশঃ সরে আসতে থাকে। একধরণের স্থিতাবস্থা পার্টিকে গ্রাস করতে থাকে এবং ঐ দুটি রাজ্যের বাইরে পার্টির বিস্তার একেবারেই থমকে যায়। প্রতিটি খেলারই নিজস্ব কিছু নিয়ম থাকে। সিস্টেমের বেঁধে দেওয়া গন্ডীর মধ্যে খেলাধুলো করতে হলে তাদের নিয়ম মেনেই খেলতে হবে। কাজেই আন্দোলন না করেও বিকাশমান শক্তি হয়ে ওঠার, প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার প্রচলিত শর্টকাট পদ্ধতিটিই যে তাঁরা বেছে নেবেন - সেটা ছিল নিছকই সময়ের অপেক্ষা। বলা যায় সেই ধারাবাহিকতাতেই এল 'সাম্প্রদায়িকতা প্রধান বিপদ' - এই অজুহাতে কংগ্রেসের সাথে চলার বা প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার আরও কাছাকাছি থেকে সেই প্রভাবকে সম্বল করে বিকশিত হওয়ার দক্ষিণপন্থী লাইন। বস্তুতঃ খেয়াল করলে দেখা যাবে যবে থেকে সি পি আই এম নেতৃত্ব আন্দোলনের রাস্তা থেকে সরে এসেছেন, তবে থেকেই তাঁদের কেন্দ্রীয় লাইনগুলোর মধ্যে নীতির চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে প্র্যাগম্যাটিজম। এবং এই প্র্যাগম্যাটিজম সবচেয়ে ভালো বুঝতেন আর কেউ নন, স্বয়ং জ্যোতি বসু। খেয়াল করে দেখুন, এই প্র্যাগম্যাটিক পলিটিক্স এ জ্যোতিবাবু এবং তাঁর অনুগতরা কি কি প্রস্তাব রাখতে রাখতে গেছেন ? সেই '৯৬ সালের প্রধানমন্ত্রী হওয়া প্রসঙ্গে 'ঐতিহাসিক ভুল' থেকে শুরু করে হালে কংগ্রেসের উপর থেকে সমর্থন না তোলা - প্রতিটা ক্ষেত্রেই তাঁর এবং মূলতঃ বঙ্গের কমিউনিস্টদের অনুসৃত লাইনটি কিন্তু সি পি আই এমের বর্তমান রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে কনসিসটেন্ট। এবং সেটা অনুসরণ করলে আর পাঁচটা মেইনস্ট্রীম রাজনৈতিক দলের মত প্রাসঙ্গিক থাকতে সি পি এমের খুব একটা অসুবিধে হত না। তারা দিব্যি কেন্দ্রীয় সরকারে যেতে পারত, মন্ত্রীত্ব পেত, এবারে কংগ্রেসের সাথে থাকলে তৃণমূলের সাথে কংগ্রেসের জোট হত না, পঃ বঃ তে তাদের এই ভরাডুবি হত কি না সন্দেহ। যদিও সেই পথ অনুসরণ করলে সি পি এমের দক্ষিণায়ন সম্পূর্ণ হত এবং সেক্ষেত্রে নামের মধ্যে থেকে 'কমিউনিস্ট', 'মার্ক্সবাদী' - এইসব তকমাগুলো ঝেড়ে ফেলাই সঙ্গত হত। সেটাই হত এই রাজনৈতিক প্র্যাগম্যাটিজমের সঙ্গে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাপার।

কিন্তু সি পি আই এমের সমস্যা হল নেতৃত্বের একাংশ (যেমন প্রকাশ কারাত) এবং কর্মীদের একাংশ এই প্র্যাগম্যাটিক লাইনটি অনুসরণ করার জায়গায় নেই। তাঁরা না তো সেই আপোষহীন আন্দোলনের পুরোনো ঘরানায় ফিরতে চাইছেন, না পুরোদস্তুর ক্ষমতার অংশ হয়ে উঠতে পারছেন। প্রথাগত বাম রাজনীতি এবং ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আছে সেই দ্বন্দ্বে তাঁরা দীর্ণ। এতদিন তাঁরা ভাবতেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন দানের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের একটা আপাতঃ সমাধান তাঁরা করতে পেরেছেন, যেখানে সাফল্যের কৃতিত্ব নেওয়া যায়, কিন্তু ব্যর্থতার দায় নিতে হয় না। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়। শাসকশ্রেণী তো বোকাগাধা নয়। তারা তখনই ক্ষীরটা খেতে দেবে যখন তারা তাদের এজেন্ডাগুলোও আদায় করে নিতে পারবে। আর তাই শিল্পায়নও করতে হবে তাদের নির্দেশ মত, সেজ করতে হবে, জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মুলতুবি রাখতে হবে, শিল্পায়নবিরোধী গণ আন্দোলনকে কড়া হাতে দমন করতে হবে, প্রয়োজনে লাঠি গুলি চালাতে হবে, এবং শ্রমজীবী মানুষের সাথে বামপন্থীদের যে লড়াই এর ঐক্য - তাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। বিনিময়ে পাওয়াও যাবে অনেক কিছুই। যেমন গোটা সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম পর্বে কংগ্রেস টুঁ শব্দটিও করে নি। সি পি এমের কার্যকলাপে মৌন সমর্থন দিয়ে গেছে। পাল্টা হিসেবে কংগ্রেস চেয়েছিল পরমাণু চুক্তিতে বামেদের সহযোগিতা। কারাতসহ নেতৃত্বের একাংশ সেটি তো দিলেনই না, উল্টে গণভিত্তি হারানোর ভয়ে এবং বাম ইমেজ পুনরুদ্ধারের তাগিদে সমর্থন তুলে নিলেন। তো সেই আচরণ সি পি আই এমের এখনকার রাজনীতির ফ্রেমওয়ার্কের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হল না। রাজনৈতিক প্র্যাগম্যাটিজমের কাঠামোর সঙ্গে এই বাম ইমেজ-পুনরুদ্ধার-প্রকল্পের অন্তর্নিহিত সংঘাতটি ফেটে বেরিয়ে পড়ল। অন্য কিছু নয়, এই সংঘাতই আজ সংকটের আকার নিচ্ছে। আজ বা কাল এটা হবারই ছিল।

<u>পশ্চিমবঙ্গ</u>

সর্বভারতীয় ক্ষেত্র থেকে মুখ ফেরানো যাক পঃ বঃ এর দিকে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে পঃ বঃ এর সি পি আই এমের সৎ কর্মী ও সমর্থকদের অনেকেই কিছুটা মতাদর্শগত অসহায়তার মধ্যে পড়েছেন। এক ধরণের নিরাপত্তাহীনতাতেও ভুগছেন। খুব স্বাভাবিক। যে তাঁদেরই সাথে সি পি এমের হয়ে প্রচার করল, তাঁদেরই সাথে বুথে বসল, সে ই ভিতরে গিয়ে ভোটটা অন্য দলকে দিয়ে এল, এবং একজন দুজন নয়, দলে দলে লোক এটা করেছে আর কেউই প্রকাশ্যে বলছে না। ফলে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের বিশ্বাস করতে পারছেন না। সাধারণ মানুষ যদি তাঁদের মনের কথা বামপন্থীদের না বলেন সেটা একজন প্রকৃত বামপন্থীর কাছে যন্ত্রণার - এ নিয়ে সন্দেহ নেই। অনেকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার তাগিদে নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছেন এই ভেবে, যে ১৯৩২ এ হিটলারের উত্থানও এভাবেই হয়েছিল। অর্থাৎ পঃ বঃ এর সি পি এম বিরোধী হাওয়া = বামপন্থা বিরোধী হাওয়া = দক্ষিণপন্থী হাওয়া = ফ্যাসীবাদ। এর মধ্যে যে ভাবনাটা অনুক্ত থাকে সেটা হল 'সি পি এম প্রকৃত বামপন্থী পথের পথিক'। যাঁরা এভাবে ভাবছেন, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে তাঁরা নিজেদের তথাকথিত 'বামপন্থা'কে প্রশ্ন করার দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন। কারাত বা নেতৃত্বের একাংশের পুরোপুরি দক্ষিণপন্থী অবস্থান নিতে দোদুল্যমানতা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সি পি এমের বেশ কিছুটা ক্ষতি করেছে - এ নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার কতটুকু প্রভাব পড়েছে পঃ বঙ্গে ? এখানে তো বরং ভোট হয়েছে বামপন্থী ইস্যুতে। শিল্পায়নের বর্তমান নিওলিবার‍্যাল পথটিই জারি থাকবে কি না, গায়ের জোরে জমি অধিগ্রহণ হবে কি না, শাসকদল দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে কি না, সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন থমকে গেছে কি না, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে যা হয়েছে ঠিক হয়েছে কি না - এগুলোর কোনটা দক্ষিণপন্থী ইস্যু বলে তাঁরা মনে করেন ? উল্টে দেখা গেল আজীবন দক্ষিণপন্থী মমতা একটা আদ্যন্ত বামপন্থী নির্বাচনী ইস্তেহার অব্দি প্রকাশ করে ফেললেন।

কাজেই দুটো পথ। মুখোমুখি। (এই অণুবাক্যদুটো লিখে নিজেকে অশোক দাশগুপ্ত মনে হল, মাইরি

বলছি)। একটা পথ দক্ষিণায়নের বৃত্তকে সম্পূর্ণ করার। যে পথে হেঁটেছেন এবং হাঁটছেন জ্যোতি বসু, সোমনাথ চট্টো এবং পঃ বঃ এর অধিকাংশ নেতারাই। বলা বাহুল্য সেই পথের সাথে বামপন্থার সম্পর্ক সামান্যই। এ পথে আগেকার মত স্থায়ী গণভিত্তির গ্যারান্টী নেই। সমর্থন আসবে যাবে। কখনো সাফল্য, কখনো ব্যার্থতা। আর পাঁচটা সংসদীয় দলের মতই। কিন্তু তাতে উতলা না হলেও চলবে। কারণ ক্ষমতার কাছাকছি থাকা যাবে। মেইনস্ট্রীমে প্রাসঙ্গিক থাকা যাবে। আর দ্বিতীয় পথটি অজানা ও ঝুঁকিপূর্ণ। আপোষহীনতার পথ। আন্দোলনের পথ। বিকাশ অথবা প্রাসঙ্গিকতা দুইই অর্জন করা যেতে পারে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ক্ষমতায় থাকা যাবে কি না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। হ্যাঁ, আরও একটা পথ আছে অবশ্য। ভরাডুবির পথ। যে পথে হাঁটছেন প্রকাশ কারাত সহ নেতৃত্বের তুলনামূলক 'বাম' অংশ। ঐ আধাখেঁচড়া বামপন্থা দিয়ে কি হতে পারে - সেটা এবারের নির্বাচনেই স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সি পি আই এমের অধিকাংশ সৎ কর্মী ও সমর্থকরা প্রকাশ কারাতেরও বামদিক হয় - এটা মানেন না। তাঁরা মনে করেন প্রকাশ কারাতের চেয়ে বেশী বাম মানে আসলে বন্দুক নিয়ে মাওবাদীদের মত জঙ্গলে চলে যাওয়া - অর্থাৎ অতিবাম হঠকারিতা। এবং তাঁদের চিন্তার এই ধরণ দেখে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় বর্তমান আত্মসমীক্ষার অভিঘাতে বিগত কয়েক বছরের টানাপোড়েনকে পাকাপাকিভাবে পরাস্ত করে দক্ষিণপন্থী ধারাটিকেই সি পি আই এম শেষ অব্দি আপন করে নেবে। আজকের মতাদর্শগত কনফিউশন যে সমস্ত কর্মীদের এক দুবারের জন্যে হলেও 'বিপ্লব' শব্দটাকে অনেকদিন পর মনে করিয়েছে, তাঁদের কেউ কেউ সেই পরিণতিতে হতাশ হয়ে পাকাপকি বসে যাবেন, কেউ সময়ের নিয়মে এবং প্রাসঙ্গিক থাকার তাড়নায় সেই পথের স্বপক্ষে নিজের মত করে যুক্তি সাজিয়ে নেবেন নিজের কাছেই।

মে ২৪, ২০০৯